২. কংগ্রেসের উদার ও নরমপন্থী ধারা (The Liberal and Moderate Phase in Congress)

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রথম কুড়ি বছরের ঘটনাক্রম, নেতৃত্বের ধারা, চিন্তাভাবনার সূত্র এবং অবশ্যই মতাদর্শ, উদ্দেশ্য ও নীতির দিকে দৃষ্টি দিলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, সময়টা ছিল কংগ্রেসের নরমপন্থার যুগ। নরমপন্থা বলতে জনস্বার্থের ও সর্বভারতীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও দাবি আদায়ের প্রশ্নে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সরাসরি বিরোধিতার প্রশ্নে এই যুগের নেতৃত্ব ছিলেন নরম বা বলা চলে উদারবাদী। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সূচনার প্রথম কুড়ি বছর এক অর্থে নেতৃত্বের গতি ছিল জাতীয়তাবাদী, যেখানে মূল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক মুক্তি বা স্বাধীনতার জাগরণ, জাতীয় চেতনাকে সুসংবদ্ধ করা এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয় রাজনীতির শিক্ষা প্রসারিত করা। প্রধানত মূল ও জনচিত্তের সপক্ষে দাবিগুলিকে সামনে রেখে জনমত গঠন ও জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ছিল উদার জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রবণতা। প্রথম যুগের নেতাদের চেতনায় ছিল 'ভারত একটি জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে চলেছে' এবং জাতীয়তার বীজ রোপণ করাটাই এই সময়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইংরেজ বিরোধিতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্ম, জাতপাত, আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠে ঐক্য ও সংহতির নীতিকে দৃঢ় করা। তবে একথা বলা যাবে না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতার সমালোচনা উদারবাদীদের কর্মসূচিতে ছিল না। কৃষি, শিল্প, ব্যাবসা এবং আর্থিক ক্ষেত্রে শোষণের চেহারা এদের চিন্তা বা ভাবনায় প্রতিফলিত হয়নি তা নয়। হিউম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আলোকিত চরিত্র তুলে ধরতে চাইলেও, দাদাভাই নৌরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, গণেশ বাসুদেব জোশি সকলেই এটা বুঝেছিলেন—(১) ব্রিটিশ আর্থিক শোষণের সঙ্গেই ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের যোগ আছে; (২) ভারতীয়রা মার্কিন দাসেদের চেয়েও দীন ও হীন অবস্থায় আছে, ব্রিটিশ প্রভুদের সম্পত্তি হয়েও এই মানব সম্পদের কোনো যত্ন বা সুরক্ষা এদেশে নেই; (৩) ভারতের প্রচলিত শিল্প ধ্বংসসাধন ও ব্যাপক হারে বিদেশি পুঁজির বিস্তার ঘটেছে। এই বিপজ্জনক অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তিনটি মূল কর্মসূচির কথা বলেছেন কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্ব—(ক) সক্রিয় প্রশাসনিক নীতি, (খ) দারিদ্র্যের অপসারণ ও ভারতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রসার এবং (গ) ভারতীয় শিল্পকে অগ্রসর করতে স্বদেশির প্রচার।

ভারতে **নরমপন্থী ধারার বৈশিষ্ট্যকে** বুঝে নিতে গেলে প্রধানত চারটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করতে হবে—(১) কংগ্রেস নেতৃত্ব, (২) কর্মসূচি, (৩) রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি, (৪) নরমপন্থী আন্দোলনের আবেদন, সাফল্য ও ব্যর্থতা।

(১) নরমপন্থী নেতৃত্ব : কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রথম কুড়ি বছরের গতিটি লক্ষ করলে দেখা যাবে সূচনা পর্বে কংগ্রেস যেন ব্রিটিশ উদারনৈতিক দলেরই এক প্রতিলিপি মাত্র। এই পর্বে কংগ্রেসের অধিবেশনগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় ইংরেজি শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, উদার উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকেরাই নেতৃত্বের শীর্ষে আরোহণ করেছেন। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট, ইংরেজ সরকারের স্থায়ী কাউন্সেল (Standing Counsel), বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সদস্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কে (বনার্জি) বেছে নেওয়া হয়েছে কংগ্রেস-এর প্রথম সভাপতি হিসাবে। পূর্বনির্ধারিত পুনার বদলে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের স্থান হল বোম্বাই। অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ছিলেন এই অধিবেশনের সাধারণ সম্পাদক। গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের

অভ্যর্থনা হলে সমবেত হয়েছেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, বিশিষ্ট লেখক লালা বৈজনাথ, অধ্যাপক সুন্দর রমন, আর. জি. ভাণ্ডারকার, *পুনা সার্বজনিক সভার* সম্পাদক দ্যানপ্রকাশ, *মারাঠা, কেশরী, নব বিভাকর, ইন্ডিয়ান মিরর, হিন্দুজানি, দি ট্রিবিউন, দি ইন্ডিয়ান স্পেকটেটর, ইন্দুপ্রকাশ, হিন্দু, ক্রিসেন্ট* প্রমুখ পত্রিকার সম্পাদকগণ। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি নিজে এবং নরেন্দ্রনাথ সেন এসেছেন কলকাতা থেকে, পুনার প্রতিনিধিত্ব করেছেন ডব্লিউ. এস. আপ্তে, জি. জি. আগারকার, লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা, বোম্বে কর্পোরেশনের নেতা ডি. ই. ওয়াচা, এন. জি. চন্দ্রভারকর, মহাজন সভার সভাপতি পি. রঙ্গাইয়া নাইডু, মাদ্রাজ থেকে এসেছেন সুব্রমনিয়া আয়ার, পি. আনন্দ চারলু, জি. এস. সুব্রমনিয়া আয়ার, এস. ভীরু বঙ্গভরা বিয়াস, অনন্তপুর থেকে কেশব পিল্লাই। সর্বোপরি সভা অলংকৃত করেছেন দাদাভাই নৌরোজি, কে. টি. তেলাং ও ফিরোজ শাহ মেহতা— কংগ্রেসের উদারবাদী নেতৃত্বের তিন পিতৃসম পুরুষ। কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রথম পর্যায়ে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত নেতাদের তালিকাটি বিশেষ কৌতূহলপ্রদ :

১.	উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি	(১৮৮৫)	১২.	রহিমতুল্লা এম. সায়নি	(১৮৯৬)
২.	দাদাভাই নৌরোজি	(১৮৮৬)	১৩.	সি. শঙ্করন নায়ার	(১৮৯৭)
৩.	বদরুদ্দিন তায়েবজি	(১৮৮৭)	১৪.	আনন্দমোহন বসু	(১৮৯৮)
৪.	জর্জ ইউল	(১৮৮৮)	১৫.	রমেশচন্দ্র দত্ত	(১৮৯৯)
৫.	উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন	(১৮৮৯)	১৬.	এন. জি. চন্দ্রভারকর	(১৯০০)
৬.	ফিরোজ শাহ মেহতা	(১৮৯০)	১৭.	ডি. এল. ওয়াচা	(১৯০১)
৭.	পি. আনন্দ চারলু	(১৮৯১)	১৮.	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	(১৯০২)
৮.	উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি	(১৮৯২)	১৯.	লালমোহন ঘোষ	(১৯০৩)
৯.	দাদাভাই নৌরোজি	(১৮৯৩)	২০.	স্যার হেনরী কটন	(২০০৪)
১০.	আলফ্রেড ওয়েব	(১৮৯৪)	২১.	গোপালকৃষ্ণ গোখলে	(২০০৫)
১১.	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	(১৮৯৫)	২২.	দাদাভাই নৌরোজি	(২০০৬)[৫]

এই সময় কংগ্রেস নেতৃত্বের সাধারণ চরিত্রটি বিশেষ স্পষ্ট—(১) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে, ব্রিটিশ রাজশক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়েই সংগঠন পরিচালনার কাজ চলেছে। (২) সভাপতি নির্বাচন ও সাংগঠনিক কিছু কর্মকাণ্ড ছাড়া, প্রতিনিধি জমায়েত ও অভ্যর্থনার বাইরে অধিবেশনে তেমন কোনো প্রস্তাব আসেনি। কংগ্রেস সংগঠনকে জোরদার করা বা সরকার বিরোধী প্রস্তাব নেওয়া সংগঠনের প্রথম পর্যায়ে সম্ভব ছিল না। জাতীয়তাবাদের শক্তিকে উজ্জীবিত করা এবং ব্রিটেন ও ভারতের অটুট বন্ধন রক্ষা করাই ছিল নরমপন্থী নেতৃত্বের লক্ষ্য। নেতৃত্ব চেয়েছে কংগ্রেস ও ভারতীয় দাবিদাওয়ার স্বপক্ষে ব্রিটিশ জনমতকে জাগরিত করতে। ব্রিটেনে প্রতিনিধি পাঠানো, কমন্স সভায় ভারতের বিষয়ে আলোচনা, ভারত বিষয়ে প্রচারপুস্তিকা বিতরণ ছাড়া নেতৃত্বের সামনে অন্য কিছু বিষয় তেমন ছিল না। (৩) সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল হিউমের যত্নেই লালিত ছিল এই সংগঠন এবং ব্রিটিশ সরকারের আনুকূল্যের উপর অটল বিশ্বাস রেখেই চলেছে কংগ্রেসের প্রথম প্রজন্মের নেতৃত্ব। এটাও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ, এই দীর্ঘ সময়ে কংগ্রেস অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে হিউমই কাজ করেছেন এবং তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই অনেকটা চালিত করেছে কংগ্রেসকে। কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যা প্রতিটি অধিবেশনেই বেড়েছে এবং সর্বভারতীয় সংগঠন হিসাবে নিজেকে উপস্থিত করতে পারলেও (পঞ্চম অধিবেশনে ১৮৮৯ জন প্রতিনিধি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমবেত হয়েছেন) হিউমের প্রভাব প্রতিপত্তি

সংগঠনে দীর্ঘকাল থেকেই গেছে।[৬] যদিও প্রথম পাঁচটি অধিবেশনের পর হিউম এককভাবে আর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন না। কংগ্রেস সংগঠনে এই পর্বে হিউমের সঙ্গে পি. অযোধ্যা নাথ (১৮৯০), পি. আনন্দ চারলু (১৮৯১, ১৮৯২), ডি. ই. ওয়াচা (১৮৯৫-১৯০৫) প্রমুখ যুক্ত ছিলেন।

ড. সচ্চিদানন্দ সিংহ কংগ্রেস নেতৃত্ব ও অধিবেশন সম্পর্কে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ধারণা পোষণ করেছেন এলাহাবাদ কংগ্রেসের (১৮৮৮ খ্রি.) অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে। একজন প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যাত্রী হিসাবে সম্মেলনে সাধারণ আসনের একটি ১৫ টাকার টিকিট কেটে অভ্যাগত হিসাবে উপস্থিত থেকে তাঁর নজরে এসেছে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টন্যান্ট গভর্নর এবং অযোধ্যার মুখ্য কমিশনার হিসাবে স্যার অকল্যান্ড কলভিনের অসহযোগিতা ও নানাভাবে সম্মেলনের অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও, অকল্যান্ড ও হিউমের মধ্যে প্রবল বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও অধিবেশনকে সফল করতে উদ্যোগী হয়েছেন দ্বারভাঙার মহারাজ ও এলাহাবাদের বিশিষ্ট নাগরিকবর্গ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পণ্ডিত অযোধ্যা নাথ, জর্জ ইউল (নির্বাচিত সভাপতি), বিশিষ্ট বাগ্মী ও সংগঠক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ফিরোজ শাহ মেহতা প্রমুখের উপস্থিতি, বক্তৃতা আকর্ষক হলেও, কার্য পরিচালনার সভা (Business Meeting) ও এর কাজকর্মের ধারা ছিল একান্ত আনুষ্ঠানিক। লিখিত বিবরণ, বিতর্ক বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নথিপত্র রাখার ব্যবস্থা ছিল না। প্রস্তাব হিসাবে বিষয়কে লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ বা ইচ্ছাও সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে দেখা যায়নি। সভার কাজ চালানোর অভিজ্ঞতা বা সিদ্ধান্ত নেবার মতো তৎপরতা হিউমের মতো একজন ব্রিটিশ আধিকারিকের ছিল না বলেই শ্রীসিংহ দাবি করেন। লেখকের মতে, কংগ্রেস কমিটির সভাগুলিতে শিক্ষা, আর্থিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তার কোনো ছাপ পড়েনি। শিক্ষিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশভূষায় ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব থাকলেও, সভা চালাবার কোনো কার্যকরী অভিজ্ঞতা ছিল না। সভাপতি বা সম্পাদকদের দৃঢ় বা জোরালো নেতৃত্বের অভাব থেকে গেছে।[৭]

এক কথায় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্ব—বড়োলাট আর ভারত সচিবেরা কী ভাবেন, এদের মধ্যে ভালোমন্দের বিচার যেভাবে করেছেন, লিটন, রিপন, ডাফরিন বা হিউমের নীতি, বিতর্ক ও মনোভাবের ওপর যতটা নির্ভর করেছেন, শ্বেতাঙ্গ রাজনীতির চাপ বা অনুকূলে যতটা চলেছেন, পরিষদীয় রাজনীতি নিয়ে যতটা অনুরাগ দেখিয়েছেন, দেশের পরিস্থিতি বা ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সংকট নিয়ে তেমনভাবে মাথা ঘামাননি। নৌরোজি বা রমেশচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি সম্পর্কে সচেতন হলেও বা সুরেন্দ্রনাথ ও জোশির মতো নেতৃবর্গ শিক্ষা ও সংস্কৃতির বা স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গুরুত্ব দিলেও, প্রথম কুড়ি বছরের নেতৃত্ব 'আবেদন, ধীরে চলো, মেনে চলো নীতি'র অধিক কিছু ভাবেননি।

(২) কর্মসূচি : নরমপন্থী নেতৃত্বের কর্মসূচির মধ্যেই তার উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। নরমপন্থী নেতৃত্বের কর্মসূচির দিকে দৃষ্টি দিলে স্পষ্টই চোখে পড়ে বাৎসরিক সম্মেলনের আহ্বান এবং কিছু প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া এই পর্বে কংগ্রেসের আর তেমন কোনো কাজ ছিল না। সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা বা দেশের মুক্তির চেয়ে বিভিন্ন প্রস্তাবগুলিতে প্রধানত সংস্কারের জন্য সরকারের কাছে দাবি (আবেদন) জানানো হয়েছে। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—ভারতীয় প্রশাসনকে তৎপর করতে রয়্যাল কমিশন নিয়োগ, ভারত-পরিষদের অবলুপ্তি, আইন পরিষদে কেন্দ্র ও রাজ্যের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি, সভ্যদের আরও অধিক অধিকার দান, সামরিক ব্যয় হ্রাস, ভারতের স্বার্থে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক নির্ধারণ, ভারতে রাষ্ট্রকৃত্যক পরীক্ষা গ্রহণ ও এই পরীক্ষায় বসার বয়স বৃদ্ধি, স্থানীয় সংস্থার হাতে অধিক ক্ষমতা দান, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক রাখা, লবণ কর হ্রাস, কৃষকদের উপর জমিদারি শোষণ ও উৎপীড়ন বন্ধ করা, ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রেলযাত্রার সাধারণ সুবিধা দান, কারিগরি ও পেশাদারি শিক্ষাকেন্দ্র (কলেজ) স্থাপন এবং সর্বোপরি দেশের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সংস্থান ও ব্যবস্থা। কর্মসূচির সফল প্রয়োগের জন্য নরমপন্থী নেতৃত্ব ব্রিটিশ সুবিচার ও বিবেকের উপর আস্থা রেখেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব মনেপ্রাণে এটাই বিশ্বাস করেছে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন নয়, সরকারের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ জনমতকে প্রভাবিত করা দরকার। ইংরেজ জাতির বিবেচনা ও শুভবুদ্ধির উপর তাদের আস্থা আছে।[৮]

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে **চারটি উদ্দেশ্যের** কথা সভাপতির তরফ থেকে উপস্থিত করা হয়েছে তা হল— (১) দেশের সকল মানুষ ও কর্মীর মধ্যে বন্ধুত্ব রক্ষা ও প্রসার। (২) প্রাদেশিক পূর্বসংস্কার না রেখে জাতীয় উদ্দেশ্য বিকাশ ও সংহতিসাধন। প্রসঙ্গত লর্ড রিপনের রাজত্বকালকে স্বাগত জানানো হয়েছে। (৩) দেশের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষিত শ্রেণির অভিজ্ঞ মতামতকে গ্রহণ করা। (৪) জনস্বার্থে আগামী এক বছরের কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতি স্থির করা। **নয়টি প্রস্তাবের** মধ্যে রয়্যাল কমিশনের মাধ্যমে ভারতীয় প্রশাসনের উপর সমীক্ষা এবং ভারত পরিষদের অবসানের দাবি উঠেছে। আইন পরিষদের নিয়োগ নয়, ভারতীয়দের নির্বাচন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা, পাঞ্জাবে পরিষদ স্থাপন এবং কমন্স সভার স্থায়ী কমিটিতে আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিবাদ গ্রহণের দাবিও উঠেছে। রাষ্ট্রকৃত্যকে বয়ঃবৃদ্ধির প্রস্তাবও ওই অধিবেশনে ওঠে। উর্ধ্ব বর্মাকে (Upper Burma) ভারত থেকে পৃথক করার নীতির বিরোধিতা এবং এর ভারতভুক্তির দাবিও এই অধিবেশনের অন্যতম প্রস্তাব ছিল।[৯] দাদাভাই নৌরোজির সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে *ভারত সভার* অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা মদনমোহন মালব্যের উপস্থিতিতে আরও সর্বাঙ্গীণ ও বোধগম্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। জনকৃত্যক কমিটি গঠন, কমিটি কর্তৃক আট-দফা বিবৃতি অনুমোদিত হয়। দারিদ্র্য, জুরির বিচার, বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণের প্রশ্ন এই অধিবেশনে আলোচিত হয়। বিভিন্ন স্তরে কংগ্রেস কমিটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই সভার সমাপ্তির পর লর্ড ডাফরিন উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের একটি আসর আপ্যায়িত করেন। কংগ্রেস ও সরকারের সুসম্পর্কের এ এক অভূতপূর্ব নজির ।

বদরুদ্দিন তায়েবজীর সভাপতিত্বে মাদ্রাজের তৃতীয় অধিবেশনে **চারটি বিষয়** নজর কেড়েছে—কংগ্রেসের সংবিধান ও কাজকর্ম সম্পর্কে নিয়মকানুন স্থির ও বিবেচনার জন্য কমিটি গঠন, আইন পরিষদের ব্যাপ্তি, কারিগরি শিক্ষার জন্য সরকারের কাছে আবেদন এবং অস্ত্র আইন সংশোধনের মাধ্যমে দেশের মানুষের আনুগত্যের ধারাকে অটুট রাখা। এলাহাবাদ অধিবেশনে (চতুর্থ) প্রতিনিধির উপস্থিতি, ব্রিটিশ সরকারি তরফে কলভিন-হিউম বিতর্কের জন্য বিখ্যাত। পরের প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই ভারতের দারিদ্র্য এবং সরকারের সংস্কারের অগ্রগতির প্রশ্নই প্রধান পেয়েছে। সুতি বস্ত্রের উপর শুল্ক, সংবাদপত্রের উপর চাপ ও নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নে সরব হওয়া বা শিক্ষায় উদারিকরণের প্রশ্নগুলিও পরবর্তী অধিবেশনে গুরুত্ব পেয়েছে। ১৮৯৫-৯৬ ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। সরকারের নিস্পৃহ মনোভাবের বিরুদ্ধে বালগঙ্গাধর তিলক এই পর্বে জনমত গঠন ও প্রতিবাদের সরব মঞ্চ গড়ে তুলেছেন। কংগ্রেসের মধ্যেই নীতিগত প্রশ্নে ও আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। সরকারি অসহিষ্ণুতা, নিপীড়ন, র‍্যান্ডের নেতৃত্বে প্লেগ কমিটির আক্রমণমুখী আচরণ, তিলকের গ্রেপ্তারি, অপরাধ আইন সব কিছুই এই পর্বের রাজনীতিতে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। অমরাবতী (১৮৯৭), মাদ্রাজ (১৮৯৮), লক্ষ্ণৌ (১৮৯৯), লাহোর (১৯০০) সম্মেলন কংগ্রেস সংগঠনে বিতর্ক ও বিভেদের জের সৃষ্টি করলেও নীতিগতভাবে নরমপন্থার মূল ধারা থেকে দল বিচ্যুত হয়নি। কংগ্রেসের কর্মসূচির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে নরমপন্থীদের দাবির চারটি মূল ক্ষেত্র ছিল—(ক) পৌর অধিকার (বাক্ ও মতামত প্রকাশ), (খ) প্রশাসনিক সংস্কার (কর্পোরেশন, শিক্ষা, জনকল্যাণের প্রশ্ন), (গ) সাংবিধানিক আইনগত সমস্যা (আইন পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব, দলীয় সংবিধান প্রভৃতি) এবং (ঘ) অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া পেশ (এক্ষেত্রে দারিদ্র্যই ছিল মূল বিষয় এবং স্বরাজ্য ও স্বদেশির দাবি ধীরে ধীরে উঠে এসেছে)। নৌরোজি, ফিরোজ শাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, দিন ওয়াচা, মদন মোহন মালব্য, রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে সকলেই সাংবিধানিক পন্থার পক্ষে এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলার পক্ষেই ছিলেন। দেশের মানুষের দারিদ্র্য মোচনে সরকারের কাছে আবেদন বা দরবারের বাইরে অন্য কোনো ভাবনাকে এঁরা তেমনভাবে প্রশ্রয় দেননি। সম্ভবত কংগ্রেসের এই সীমিত ভাবনা থেকেই বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বিভেদ ও চরমপন্থী আন্দোলনের পরিস্থিতি।

(৩) রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি : সন্দেহ নেই 'নরমপন্থী' বা 'উদারবাদী' কংগ্রেসের এই শিরোনামটির পেছনে ছিল এদের কর্মপদ্ধতি। এককথায় এঁরা ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রশ্নে ছিলেন সংযত, নিয়মানুগ এবং সম্পূর্ণভাবে সাংবিধানিক

ধারার অনুরাগী। আইনের অভ্যস্ত ধারায়, ধীরগতি এবং শৃঙ্খলার পথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনই ছিল এঁদের লক্ষ্য। এঁদের কেন্দ্রীয় বা প্রাথমিক লক্ষ ছিল মানুষকে রাজনীতি সচেতন করা, আধুনিক উদার রাজনীতির শিক্ষায় মানুষকে জাগরিত করা এবং রাজনৈতিক প্রশ্নে একটি ঐক্যবদ্ধ, সংহত জনমত গঠন করা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে যেসব পন্থা বা পদ্ধতির আশ্রয় এঁরা নিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হল :

- সভা, সমাবেশ করা এবং বিশিষ্ট মানুষদের এই সমাবেশে হাজির করে (এঁরা অনেকেই শিক্ষা ও রাজনৈতিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ, জনমত আলোকিত ও সংগঠিত করতে পারদর্শী) বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা।
- বার্ষিক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ এবং প্রস্তাব পাসে সরকারি সাহায্য ও আনুকূল্য পাবার চেষ্টা।
- সরাসরি সরকার বিরোধিতায় না গিয়ে সংবাদপত্র ও নানা মঞ্চে সরকারি নীতির মৃদু সমালোচনা।
- সরকারের কাছে আবেদনপত্র ও স্মারকলিপি প্রেরণ।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণ ও ব্রিটিশ আইনসভার প্রতিনিধিদের ভারতের সমস্যার অনুকূলে প্রভাবিত করা। এক্ষেত্রে প্রচারপত্র ও স্মারকলিপি লেখা ও পেশের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার প্রতি ঝোঁকটিই লক্ষণীয়।
- ভারতীয় জনগণকে রাজনৈতিক সচেতন এবং ব্রিটিশ জনমতকে ভারতীয়দের আর্থিক, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করাই ছিল মূল পন্থা। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে এই উদ্দেশ্যে '*India*' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ পেয়েছে। ইতিপূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের একটি ব্রিটিশ কমিটি গঠিত হয়েছে। ব্রিটেনে প্রচারের এই কাজে দাদাভাই নৌরোজি অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। কংগ্রেসের এই অগ্রজ পুরুষের সংযত অথচ দৃঢ় প্রয়াস ছিল আকর্ষণীয়। গোখলে, রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রিটিশ উদাসীনতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন। ভারতীয় সম্পদ কীভাবে ব্রিটেনে নির্গমন হচ্ছে তা নিয়ে দাদাভাই নৌরোজি ও রমেশচন্দ্র দত্ত পুস্তক লিখেছেন এবং এদেশের ভয়াবহ দারিদ্র্যের চিত্র তুলে ধরেছেন।[১০] গোখেল দুঃখ প্রকাশ করেছেন, ব্রিটিশ সরকার এদেশ এবং এদেশের মানুষের সমস্যা বুঝতে ব্যর্থ। তবে সরকারকে বোঝানোর কাজ নিরন্তর চলবে, কার্যত এই কাজের মাধ্যমে জনগণকেই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করার কাজ চলবে, সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার পথে সংযমই বাঞ্ছনীয়।[১১]
- নরমপন্থী নেতৃত্ব সংগঠনের ব্যয়নির্বাহের জন্য বণিক, শিল্পপতি, জমিদার প্রমুখের কাছে অর্থের জন্য আবেদন করলেও এঁরা কংগ্রেস সংগঠনের স্বার্থে অতটা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। সংগঠনের স্বার্থে যুক্ত নেতৃবর্গই তাঁদের আয়ের একটি অংশ সাংগঠনিক ব্যয়নির্বাহের কাজে দান করেছেন। নৌরোজি, গোখলে সংগঠনে অর্থ জোগানের কাজে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। এক্ষেত্রে সরকার, বিশেষত, হিউমের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং রাজন্যবর্গের আনুকূল্যের উপর কংগ্রেস অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। সদস্য চাঁদা বা তহবিল গঠনের প্রশ্নটি অবশ্য গুরুত্ব পেয়েছে। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গণসংগ্রহ, সদস্য চাঁদা, অনুদান ছিল তহবিলের প্রধান সূত্র। প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ এবং বিক্রি থেকেও অর্থ এসেছে।[১২]
- নরমপন্থীরা স্বদেশির ভাবনায়ও লালিত হয়েছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল হিসাবে দেশের সম্পদ নির্গমন, দেশজ শিল্পের ধ্বংস, দেশের জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু— এ প্রসঙ্গ বারে বারেই জাতীয় নেতৃত্বের মুখে এসেছে। নরমপন্থীরা দাবি জানিয়েছেন দেশের মানুষের উপর করভার কমানোর, অবাধ বাণিজ্য নীতি বর্জিত হোক, ভারতকে শিল্পায়িত করা হোক এবং স্বদেশি শিল্পের প্রসার হোক। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দেই কংগ্রেস দাবি জানিয়েছে বিলাতি শিল্পের উপর শুল্ক বসানো হোক। অত্যধিক সামরিক ব্যয়, প্রশাসনিক ব্যয়, ঋণ ও সুদ বাবদ ব্যয়ের চাপ ভারতকেই বহন করতে হয়েছে। ওয়াচার নেতৃত্বে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্ব বিলাতি ও দেশি কাপড়ের উপর সমহারে সুদ বসানোর তীব্র নিন্দা করেছে। লক্ষণীয় স্বদেশির প্রশ্ন কংগ্রেস নরমপন্থী মহলে প্রচার পেয়েছে উনবিংশ শতকের নব্বইয়ের

দশক থেকে। কুটির শিল্প, স্বদেশি শিল্প প্রদর্শনী, বিলাতি দ্রব্য বর্জন (বিলাস দ্রব্য) এবং দেশি শিল্প ব্যবহারের প্রশ্নে কংগ্রেসের একটি মহল (বিশেষত মদন মোহন মালব্য, লালা মুরলিধর, রানাডের সমাজসংস্কার গোষ্ঠী) তৎপর ছিল। স্বদেশি ও বয়কটের ভাবনাকে সুরেন্দ্রনাথ বা গোখলের মতো নরমপন্থী নেতা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে সমর্থন করেন। তিলক আবার নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধেই স্বদেশিকে স্বরাজলাভের প্রস্তুতি হিসাবে দেখেছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে ছাত্ররা স্বদেশীয় পক্ষে জোরদার প্রচার করেছেন। সন্দেহ নেই এই সময় থেকেই ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে চরমপন্থী ভাবনার ছাপ পড়তে শুরু করে। তিলক, লাজপৎ রাইয়ের সরকারের প্রতি আক্রমণমুখী মনোভাব নরমপন্থীদের উপর প্রভাব ফেলতে না পারলেও কংগ্রেস সংগঠন ও জনমনের একাংশকে ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়ামূলক নীতির বিষয়ে ক্ষুব্ধ করেছে। কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির পূর্বেকার সাংবিধানিক ও উদার গতি আর থাকেনি। বঙ্গভঙ্গ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে গোখলে বা হিউম, ওয়াচা বা প্রবীণ নেতা দাদাভাই নৌরোজির নিয়ন্ত্রণে সংগঠনের নেতৃত্ব বজায় থাকলেও কংগ্রেসের ভাঙন স্পষ্ট হতে থাকে। স্বরাজ, স্বদেশি, বয়কটের প্রস্তাবকে আশ্রয় করেই শুরু হল রাজশক্তির বিরোধিতার নতুন পর্ব।[১৩]

(৪) নরমপন্থী আন্দোলনের আবেদন, সাফল্য ও ব্যর্থতা : ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় এবং সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি ধারা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নবমপন্থী তথা প্রথম যুগের নেতৃত্ব কিছু সাফল্য দাবি করতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের অবসান এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে নরমপন্থী ধারা কতটা সফল এই প্রশ্নে ব্যাপক বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, নরমপন্থীদের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলন যে কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের লেখক ও গবেষকেরা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করেছেন :

প্রথমত, আন্দোলনের গতি যাই হোক না কেন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই নরমপন্থী নেতৃত্বের অধীনে জাতীয়তাবাদী শক্তি এটা বোঝাতে পেরেছে পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা যাই থাক রাজশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য একটি সংগঠিত মঞ্চে মিলিত হওয়ার দরকার। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের বঞ্চনা ও অসহায়তা, আর্থিক শোষণ ও সামরিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র অভ্যুত্থান বিগত কয়েক দশকে ঘটে গেলেও, আদর্শ, নেতৃত্ব বা গণচরিত্রের দিক থেকে এগুলি ছিল অপূর্ণ। বিক্ষিপ্ত ও স্থানীয় আন্দোলন, বিদ্রোহ ও গণ-আন্দোলনে সর্বভারতীয় চরিত্রের অনুপস্থিতি, সর্বোপরি রাজনৈতিক ঐক্য ও সচেতনতার অভাব একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী সংগঠনের ধারণাকে আরোপ করেছে। সংগঠন গড়ার প্রেরণা বা উদ্যোগ ব্রিটিশ রাজপুরুষের (হিউম) পক্ষ থেকে এলেও জাতির নবজাগরণের শক্তি ইতিমধ্যেই সঞ্চিত হয়েছে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, প্রমুখের মাধ্যমে এবং এই শক্তিকে সংগঠিত করলেন উদার নেতৃত্ব। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মঞ্চ গড়ে উঠল। কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হিউম বা ভাইসরয় ডাফরিনের বদান্যতা বেশি করে প্রচারে আনা হলেও, সুরেন্দ্রনাথের বঙ্গ-বিপ্লবে কিন্তু এ ক্ষেত্রে আগেই উদ্যোগী হয়েছে (জাতীয় সম্মেলন গড়ে তোলার কাজ বা সর্বভারতীয় অধিবেশন শুরু করার কাজ ওই একই সময়ে শুরু হয়েছে), যদিও হিউম বা ডাফরিনের আশীর্বাদ এঁদের পক্ষে ছিল না।[১৪] বিক্ষিপ্ত গতি, বিচ্ছিন্নতা বা বিভেদ যাই থাকুক না শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী মঞ্চ গড়ে উঠেছে, কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতৃত্বই এ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, রাজশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক, আন্দোলনের পন্থা বা পদ্ধতি যাই হোক, কংগ্রেসের উদারপন্থী নেতৃত্ব অন্তত একটি ক্ষেত্রে সাফল্য দাবি করতে পারে। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে এমন একটা ধারণা প্রথম প্রজন্মের নেতৃবর্গ তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, জাতীয়তাবোধ ও রাজনীতিক সচেতনতা গড়ে তুলতে না পারলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মঞ্চকে সফল করে তোলা সম্ভব নয়। বক্তৃতা, পত্রপত্রিকা, ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে দেশের মৌলিক সমস্যা তুলে ধরা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহের আগে প্রয়োজন দেশের মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও উদাসীন মনোভাবকে দূর করা, বৃহত্তর, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য তাদের প্রস্তুত করা। সরকারি

নিপীড়ন ও আক্রমণের মুখে না ফেলে, মানুষকে সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে সংগঠিত করার আগে তাদের চিন্তা, ভাবনা, পূর্ব-সংস্কার, সামাজিক-রাজনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ বা গতি সম্পর্কে তাঁদের সংযত শিক্ষা দেওয়া জরুরি। আন্দোলনের সামর্থ্য বা শক্তি অনেকটাই নির্ভর করে এই শিক্ষার ওপর। লড়াইয়ের আগে শত্রুর শক্তিকে যাচাই করেই এগোতে হবে—এই বিশ্বাসকেই জাগ্রত করতে চেয়েছে নরমপন্থী নেতৃত্ব। নৌরোজি থেকে গোখলে কেউই শত্রুকে না বুঝে শত্রুকে আঘাত বা সক্রিয় সম্মুখ বিরোধিতার নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না।[১৫]

তৃতীয়ত, নরমপন্থী নেতৃত্ব এটা বুঝেছিলেন ব্রিটিশ সরকারকে উদ্‌বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে রেখে কংগ্রেস সংগঠনকে চালনা করা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের প্রথম প্রজন্ম হঠকারিতা নয়, সংগঠনের সুবিধা, আন্দোলনের প্রাপ্তি মানুষের প্রাথমিক পছন্দ ও কল্যাণের কথা মাথায় রেখেই কংগ্রেসকে সংগঠিত করতে চেয়েছেন। দেশভক্তি জাতীয়বাদের মূল আদর্শকে মাথায় রেখেই দারিদ্র্য, বঞ্চনা, শোষণ ইত্যাদিকে বিচার করতে চেয়েছেন উদারবাদীরা ভারতের জাতীয় সত্তা, শক্তি ও সামর্থ্যকে সামনে রেখেই কংগ্রেসের এই সর্বসম্মত মঞ্চের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা। তাৎক্ষণিক লাভ নয়, ভবিষ্যতের স্বাধীন জাতির স্বপ্নকে সফল করতেই তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন।

চতুর্থত, নরমপন্থীরা রাজনৈতিক ভাবনা বা কর্মকাণ্ডে ব্রিটিশ রাজশক্তি তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষতিকর প্রবণতা বা প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না তা নয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা আন্দোলনের পদ্ধতিগত প্রশ্নে অনেকটাই রক্ষণশীল হলেও গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন এইসব আদর্শ প্রচারে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। দাদাভাই নৌরোজি ছিলেন 'Drain Theory' অর্থাৎ নির্গমন তত্ত্বের প্রবক্তা। এই ধারণা ব্রিটিশ রাজশক্তি বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভালো মনে গ্রহণ করেনি। উদার নেতৃত্বের আমলেই রাজনৈতিক বিস্ফোরণের কিছু সংকেত ছিল। যেমন—পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে রায়তদের বিক্ষোভ বা হাঙ্গামা লেগেই ছিল। বাংলার কৃষক দলের দুর্দশা নিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত বা ভারত সভার প্রচার আন্দোলন এই যুগে চোখে পড়ে। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের ক্ষতিকর প্রবণতার দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রশাসনিক সংস্কারের প্রশ্নে সরকারকে বারবার চাপ দিয়েছেন তাঁরা। হিউমকে নিয়ে বা বাদ দিয়েও সংগঠন ছাড়া যে আগামী দিনে সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব নয়, এই শিক্ষা আগামী কয়েক দশকে কংগ্রেসের উদারপন্থী নেতৃত্বই প্রদান করেছে। ভারতের জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার পেছনে, আশু সংস্কারের মাধ্যমে দেশকে অগ্রসর করার প্রশ্নে কংগ্রেসের প্রথম প্রজন্মের উদার নেতৃত্ব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সন্দেহ নেই। রাজস্ব-বন্ধের আন্দোলন (১৮৯৩-৯৪ খ্রি.), রানাডে বা তিলকের আন্দোলন সরকার পক্ষকে যথেষ্ট শঙ্কিত করেছে। জাতপাতের রেষারেষি, তিরুনাভেলি বা মহারাষ্ট্রের দাঙ্গায় রাজভক্তির লক্ষণ ছিল বলে ব্রিটিশ রাজশক্তি মনে করেনি। সাংস্কৃতিক বিদ্রোহে নরমপন্থীরা প্রভাব ফেলেছে। চটকল শ্রমিক আন্দোলন বা মধ্যশ্রেণি ও বৃত্তিজীবীদের জাগরণ, আবশ্যিক শিক্ষার আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলন—পুনা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলে ওয়াচা, মালব্য, তেলাং, আর. জি. ভাণ্ডারকার প্রমুখের মাধ্যমে প্রচার পায়।[১৬]

জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব যে প্রাথমিকভাবে একটি মঞ্চে সমবেত হয়ে জাতীয় জাগরণের মূল কাজটি সম্পন্ন করতে অগ্রসর হয়েছেন এবং নানা অংশের মানুষকে একটি জাতি হয়ে ওঠার চেতনা ও বন্ধনে আবদ্ধ করতে পেরেছেন এটাই প্রধান কথা। এতকাল প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের বদান্যতার অধীনে থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আধুনিক ভাবনায় যে এ দেশের মানুষ শিক্ষিত হতে পারেনি, কংগ্রেসের নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে। সম্মুখ বিরোধিতার পথে না গেলেও, আগামী দিনে কংগ্রেস যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও স্ব-শাসনের অনুকূলে সংগ্রাম চালাতে সক্ষম হবে (যা পরবর্তীকালের নেতৃত্ব করতে পেরেছে বলে অনেকেই মনে করেন) নরমপন্থী নেতৃত্ব এই ভাবনাকে লালন করতে শিখিয়েছেন। সংগঠনের আবদ্ধে না এলে যে পরবর্তীকালের জাতীয় নেতৃত্ব (গান্ধিজির দীর্ঘ সংগ্রামী ধারা যার অন্যতম) দানা বাঁধতে পারত না এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতের পরিষদীয় আইন (১৮৯২ খ্রি.), অহিংস, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন বা ভারত শাসন আইন (১৯৩৫ খ্রি.), বা স্বাধীনতা আইনের রাস্তা গড়ে দিতে কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতৃত্বের অবদানকে অস্বীকার করা